সংবাদ

21 JUL 2008

কুড়িগ্রামে মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষায় বেহাল অবস্থা

প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষার মান ও পরীক্ষার ফলাফলে বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। গত বছরের চেয়ে এবার এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষার ফলাফল কিছুটা ভাল হলেও তা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন, উপবৃত্তির টাকা বিতরণ এবং বিদ্যালয়-মাদ্রাসার জায়গা স্থানান্তর নিয়ে হাইকোর্টসহ বিভিন্ন আদালতে ৩০টির মতো মামলা বিচারাধীন এবং ৮০টির বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগ বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে। এছাড়াও শিক্ষকদেরা মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিদ্যালয় গৃহের করুণ দশা এবং শিক্ষা উপকরণসহ আসবাবপত্রের অভাবে এই বেহাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

জেলায় এমন বিদ্যালয় আছে যেখানে শিক্ষকরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি স্কুলের জন্ম দিয়েছেন। নাম একই এর একটিতে কোন ব্লাক বোর্ড পর্যন্ত নেই। আদালতে মামলা চলছে ৪টি। এক মাদ্রাসায় ১৪ জন শিক্ষক থাকলেও ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিতি মাত্র ৩৯ জন। এ মাদ্রাসায় এমন ক্লাস আছে যার ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি হাজিরা নেয়া হয়নি এক বছর। এছাড়াও একটি বিদ্যালয়ের ৮ জন এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সবাই ফেল করেছে। সরকারের আরোপিত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় মাধ্যমিক পর্যায়ের উপবৃত্তির টাকা গত দুই বছরে ফেরত গেছে ১ কোটি ৬৫ লাখ৫৬ হাজার ৪৪০ টাকা। জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, সরকারি ৫টিসহ জেলায় উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে ২৬২টি এবং দাখিল, আলিম, কামিল ও ফাজিল মাদ্রাসা রয়েছে ২৩২টি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ২৮ হাজার। গত ২০০৭ সালে জেলায় এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল ১১ হাজার ৮৪৮ জন। পাস করেছিল ৬ হাজার ১৯৪ জন। পাসের হার ৫২ দশমিক শূন্য ৩ ভাগ। জিপিএ-৫ পেয়েছিল ২৪৫ জন। দাখিল পরীক্ষার্থী ছিল ৪ হাজার ৬৬৫ জন। পাস করেছিল ২ হাজার ৯৬৩ জন। পাসের হার ৬৩ দশমিক ৫২ ভাগ। জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৬৪ জন। ২০০৮ সালে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল ১১ হাজার ৫১৫ জন। পাস করেছে ৬ হাজার ৮৫৭ জন। পাসের হার ৫৯ দশমিক ৫৪ ভাগ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৬৯ জন। দাখিল পরীক্ষার্থী ছিল ৩ হাজার ৭৫৫ জন। পাস করেছে ২ হাজার ৭৮৭ জন। পাসের হার ৭৪ দশমিক ২২ ভাগ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১১ জন।

সূত্র আরও জানায়, বিগত বছরের চেয়ে এ বছর পাসের হার কিছুটা বাড়লেও তা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের নয়। মান বেড়েছে এমটিও বলা যাবে না। কেননা অতীতে এ জেলার ছাত্রছাত্রীরা অধিকহারে দেশের ভাল কলেজগুলোতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে এমনটি ঘটেনি। বিদ্যালয় মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্ব, শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, আসবাবপত্র ও উপকরণের অভাবসহ বিভিন্ন কারণে এখানকার শিক্ষার মান ও ফলাফল ভালর দিকে যাচ্ছে একেবারে মন্থর গতিতে।

সরজমিন ঘুরে জানা গেছে, সদর উপজেলার খামার বড়াইবাড়ী গুইস্কুলকে ঘিরে এখন ৪টি মামলা বিচারাধীন। শিক্ষক ও অফিসসহকারীসহ ৯ জন দু'ভাগে বিভক্ত। প্রায় পাশাপাশি একই নামে দু'স্থানে এই বিদ্যালয়ের ক্লাস চলছে। প্রধান শিক্ষকসহ ৯ জন শিক্ষক একটি বিদ্যালয় চালাচ্ছেন। অপরটি চালাচ্ছেন অফিস সহকারীসহ ৫ জন শিক্ষক। এর একটিতে কোন ব্লাক বোর্ড নেই। বিদ্যালয়গৃহে বেড়া পাটকাটির। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাসের মধ্যে কোন পার্টিশন নেই। ছাত্রছাত্রীরা পরস্পরের উল্টোমুখে বসে যার যার ক্লাসে হাসে। জেলা শিক্ষা অফিস, শিক্ষা মহাপরিচালকের দপ্তর এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টিম এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করে গেলেও সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি।

ভুরুঙ্গামারী উপজেলার চর বারইটারী সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষকের সংখ্যা ১৪ জন। খাতা কলমে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২২৮ জন হলেও উপস্থিত পাওয়া গেছে ৩৯ জন। এ মাদ্রাসার দুটি ক্লাসের ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি হাজিরা নেয়া হয়নি ১ বছর। সদর উপজেলার মধ্যকুমোরপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে উপবৃত্তি দেয়ার নামে ১২০ থেকে ১৫০ টাকা করে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ করেছেন ওই বিদ্যালয়ের ৪৫ জন ছাত্রছাত্রী। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে।

রাজারহাট উপজেলার ভীমশর্মা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গত বছর ১ জন এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করে বিদ্যালয়টিকে শতভাগ পাসের কৃতিত্ব পাইয়ে দিয়েছিল। এবার ৮ জন অংশ নিয়ে সবাই ফেল করেছে। ফলে শতভাগ ফেলের কলঙ্ক তিলক জুটেছে স্কুলটির কাপালে। স্কুলটিতে গিয়ে দেখা গেছে ৭ম শ্রেণীতে ১ জন ছাত্র। সারধন নীলমণি এই ছাত্রের নাম ফজলে রাব্বী। ১০ শ্রেণীতে উপস্থিত পাওয়া যায় ৩ জন ছাত্রছাত্রী। স্কুলটিতে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৯৭ জন হলেও উপস্থিত পাওয়া যায় ৩৪ জনকে। অথচ উপবৃত্তির টাকা পেয়েছেন ৫২ জন। ১৯৯৯ সালে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে স্কুলটি এমপিও ভুক্ত হয়। ২০০৬ সালে ৯ম ও ১০ম শ্রেণী খোলা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা ১১ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ৩ জন। এর মধ্যে ৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ২ জন কর্মচারী নিম্ন-মাধ্যমিক শাখায় নিয়োগপ্রাপ্ত হিসেবে বেতন ভাতা পান। বাকিরা বেতন ভাতা পান না। এ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। বিদ্যালয়ের সভাপতি ইউএনও ৩ দফা সভা করেও দ্বন্দ্ব নিরসন করতে পারেননি। প্রধান শিক্ষকের দাবি, মন্ত্রণালয় ঘুরতে ঘুরতে জুতার তলা ক্ষয় করেছি। মাধ্যমিক শাখার শিক্ষকদের এমপিও ভুক্ত করতে পারিনি। অরপরও তারা যা পড়ান- তাই বোনাস। এরকম অবস্থা অধিকাংশ স্কুলের। ভাঙাচোড়া ঘর, আসবাবপত্র ও উপকরণেরও অভাবও প্রকট। এভাবেই চলছে জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা।

এ প্রসঙ্গে জেলা শিক্ষা অফিসার মো. আবুল কালাম আজাদ বিদ্যালয় নিয়ে মামলা, দ্বন্দ্বসহ নানা সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, শিক্ষার মান ও পরীক্ষার ফলাফল কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আসেনি। এজন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্বুদ্ধকরণসহ নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।